ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 262- 267
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.230

কল্লোল লাহিড়ীর ‘ইন্দুবালা ভাতের হোটেল’: নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার আখ্যান

ড. আনিসুর রহমান, *সহকারী অধ্যাপক, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.11.2025; Accepted: 21.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Kallol Lahiri has given a deep understanding of the relationship between the oppressor and the oppressed class[1]and the position of women in the Indian social system. Therefore, the narrative world of her novel has brought up the life of the people living in the inner circle of society[2], the complexity of time and the struggle of women in the patriarchal[3]social system. The novel 'Indubala Bhater Hotel' is not limited to the kitchen and food, the partition of 1947[4], the great liberation war of Bangladesh and the Naxalbari movement[5] in West Bengal have also been consciously highlighted in the narrative world of the novel under discussion. Along with this, the story of women's self-reliance[6]and struggle has emerged through the character of Indubala. The way she struggled for herself and her family despite thousands of adversities in society is a source of inspiration for women today.

Keywords: Oppressor and the oppressed Class, Inner circle of society, Patriarchal Society, The partition of 1947, Naxalbari movement, Women's self-reliance

বাংলা সাহিত্যের একজন অনালোকিত এবং অনালোচিত লেখক কল্লোল লাহিড়ী। ‘গোরা নকশাল’ (২০১৭), ‘ইন্দুবালা ভাতের হোটেল’ (২০২০), ‘নাইনটিন নাইনটি আ লাভ স্টোরি’ (২০২২), ‘ঘুমিয়ে পড়ার আগে’ (২০২৪) ইত্যাদি উপন্যাসের স্রষ্টা কল্লোল লাহিড়ী শোষক-শোষিত শ্রেণির সম্পর্ককে, ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় নারীর অবস্থানকে মর্ম দিয়ে অনুভব করেছেন। তাই তাঁর সৃষ্ট উপন্যাসের কথনবিশ্বে সমাজের অন্তেবাসী মানুষের জীবন, সময়ের জটিলতা এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর আত্মসংগ্রামের কথা উঠে এসেছে। সমালোচক বলেছেন,

> “উপনিবেশোত্তর সমাজেও সৃষ্টি ও মনন যেসব বুদ্ধিজীবির নিয়ন্ত্রণে থাকে, তাদের চিত্তবৃত্তি উপনিবেশিকৃত হলে অটুট থেকে যায় আধিপত্যপ্রবণ প্রতিবেদন গড়ে তোলার অভ্যাস। চতুর ও সচেতন পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে এবং বহু বিভাজিত সমাজের অন্তর্বৃত্ত দুর্বলতার সুযোগে যে কেন্দ্রীকৃত মহাসন্দর্ভ অজস্র গুল্মমূল ছড়িয়ে দিয়েছিল তাকে পরাভূত না করা পর্যন্ত উপনিবেশোত্তর সমাজে কোনো যথার্থ নতুন সংস্কৃতি, সাহিত্য কিংবা জীবনবোধের সূত্রপাত হতে পারে না। গড়ে উঠতে পারে না কোনো নতুন প্রতিবেদন।”[১]

কল্লোল লাহিড়ী যেন সেই নতুন জীবনবোধেরই স্রষ্টা। কেননা তাঁর কথনবিশ্বের অন্দরমহলে প্রবেশ করলেই বোঝা যায় যে, অন্তেবাসী মানুষ, শোষিত নারী কোনো করুণার পাত্র নয়, বরং তারা অসহায়তার মধ্যেও অদম্যভাবে বেঁচে থাকার বলিষ্ঠ প্রতীক। ‘ইন্দুবালা ভাতের হোটেল’ কল্লোল লাহিড়ীর সেই পরিচয় বহনকারী একটি জনপ্রিয় আখ্যান। শুধুমাত্র রান্নাঘর আর খাবারেই আটকে থাকেনি ‘ইন্দুবালা ভাতের হোটেল’, ১৯৪৭ সালের দেশভাগ, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং পশ্চিমবঙ্গের নকশালবাড়ি আন্দোলনকেও সচেতনভাবে তুলে ধরা হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসের

প্রতিবেদনে। সেইসঙ্গে ইন্দুবালা চরিত্রের মাধ্যমে নারীর আত্মনির্ভরশীলতা এবং সংগ্রামের গল্প উঠে এসেছে। সমাজের হাজার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি নিজের ও পরিবারের জন্য যেভাবে সংগ্রাম করেছেন, তা আজকের নারীদের জন্য এক অনুপ্রেরণার উৎস।

গ্রামকেন্দ্রিক পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর অবস্থান ছিল অন্তঃপুরে। সেই বৈদিক যুগ থেকে বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত নারী পুরুষ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। তাদের শেখানো বুলিকেই নারীরা তাদের আদর্শ হিসেবে মেনে নিয়েছে। এমনকি অনেক প্রাচীন শাস্ত্রে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, নারী সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। খুব দুঃখের বিষয় যে, সমাজপতিদের চোখে নারী ঊনমানব হিসেবেই পরিগণিত হয়ে এসেছে এতদিন। কিন্তু নারী আজ নিজের ধৈর্য ও সহনশীলতার গুণে সকল ক্ষেত্রে নিজ-পরিচয় দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিয়েছেন। নারী আজ আর শুধু অন্তঃপুরের পরিচারিকা নন, তিনি সংসারের হাল ধরার সর্বময় কর্ত্রীও বটে। আমাদের আলোচ্য কল্লোল লাহিড়ীর 'ইন্দুবালা ভাতের হোটেল' উপন্যাসের আখ্যানের প্রতিবেদনেও ধরা আছে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন পেরিয়ে ভাষা আন্দোলনে শহিদ পরিবারের মেয়ে ইন্দুবালার আত্মপ্রতিষ্ঠার কাহিনি।

আমরা জানি, প্রত্যেক নারীজীবনের দুই পর্ব। প্রথম পর্ব অতিবাহিত হয় পিতা-মাতার সংসারে আর দ্বিতীয় পর্ব অতিবাহিত হয় স্বামী-সন্তানের সংসারে। যারা ভালো কপাল নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন তারা দুই পর্বেই সুখী জীবন অতিবাহিত করেন, আর যাদের কপালপোড়া তাদের দুই পর্বই কাটে চোখের জল ফেলে। আমাদের ইন্দুবালা মন্দ ভাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল বলে তার জীবনের দুই পর্ব-ই কেটেছিল অশেষ দুঃখে। কিন্তু দুঃখে তিনি ভেঙে পড়েননি। শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে জীবনযুদ্ধে শামিল হয়েছেন। মানুষের মতো মানুষ করেছেন তিন সন্তানকে; সঙ্গে বাঁচিয়ে রেখেছেন আরও অনেক মানুষকে।

আমরা ইন্দুবালার জীবনসমুদ্রে ডুব দিতে গিয়ে দেখি, ওপারের খুলনার কলাপোতার মেয়ে ইন্দুবালার বিবাহিত জীবন খুব একটা সুখের ছিল না। যে পাত্রের পরিচয় করানো হয়েছিল 'মাস্টার' বলে আদতে সেই রতনলাল মল্লিক ওরফে ইন্দুবালার স্বামী তাস, পাসা এবং জুয়া খেলার মাস্টার। প্রথম বউ মারা মারা যাবার এক বছরের মধ্যে বিয়ে হচ্ছে বলে সব কিছু লুকিয়ে রেখেছিল শ্বশুরবাড়ি। তাই কোনো আয়োজনের ব্যবস্থা হয়নি শ্বশুরবাড়িতে। বাঙালি ঘরের বিয়েতে বধূবরণের যেসব আচার আছে তার একটাও অনুষ্ঠিত হতে দেখিনি আমরা ইন্দুবালার বিয়েতে,

> "কিন্তু এদিকে সত্যিই কোনো অনুষ্ঠান ছিল না। কোনো লোকজন আসেনি। সানাই বাজেনি। একটা ন্যাড়া বাড়ি দেখে বাবার শুধু চোখ উজিয়ে জল এসেছিল। বাড়ির বাইরে থেকে মেয়েকে বিদায় জানিয়ে ভাইয়ের হাত ধরে তক্ষুনি ফিরে গিয়েছিল দেশে।"[২]

কপোতাক্ষের গাঁয়ের মেয়ে যখন ভাগীরথীর পাড়ে এসে প্রথম পা দিল তখন কেউ শাঁখ বাজাল না। এমনকি কালো পাথরের থালায় দুধে আলতা মিশিয়ে কেউ পা ছোঁয়াতে বলল না। এমন বিবাহের আয়োজন দেখে ইন্দুবালারও ইচ্ছে হয়েছিল ছুটে চলে যেতে গাঁয়ে। কিন্তু যেতে পারেনি। আসলে বাঁধা পড়েছিলেন নতুন সংসারে। নারীদেহলোভী স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসা না থাকলেও শাশুড়ির প্রতি ছিল অগাধ নিষ্ঠা এবং ভক্তি। তাই এমন মন কেমনের দিনে ইন্দুবালা নিজেকে নিয়োজিত করেছিল শাশুড়ির সেবায়।

অন্যদিকে আস্তে আস্তে ইন্দুবালার কাছে পরিষ্কার হয়ে আসে স্বামীর আসল চেহারা। বুঝতে পারে স্বামীর কাছে তার মূল্য অর্থ ও দেহের বিনিময়ে। আসলে ভারতীয় সমাজব্যবস্থায়,

> "নারী একক একব্যক্তি হিসেবে, পৃথক একটি মানুষ হিসেবে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনযাপন করবার আধিকার অর্জন করেনি। তার জন্ম কারো 'বংশরক্ষা' করেনা। নারীর জন্ম কোনো উপার্জনের উৎস নয়। নারী কেবল পুরুষের লালসা নিবারণ করবে এবং তাকে পুত্র সন্তান উপহার দেবে।"[৩]

তার স্বামী অষ্টপ্রহর ডুবে থাকত নেশায়। দোজবরে মাতাল এক পুরুষের সঙ্গ ইন্দুবালাকে অষ্টপ্রহর কষ্ট দিয়ে যেত। কেবল ফি রাতে দ্রুত সহবাস ছাড়া স্বামী সোহাগ কাকে বলে ইন্দুবালা তা জানতে পারেনি,

> "প্রথম রাতে তাই সোহাগ উঠেছিল তার দিক থেকে মাত্রা ছাড়া। ইন্দুবালা এত সবের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। যখন ঘাড়ের ওপর ওই দশাসই চেহারা চেপে বসে একটু একটু করে কৌমার্য শুষে নিচ্ছিল তাঁর, তখন একেবারের জন্যেও মনিরুলকে মনে পড়েনি ইন্দুবালার। ব্যথায় চোখ বন্ধ

> করলে উঠোনের জোনাকি গুলোকে দেখতে পেয়েছিলেন স্পষ্ট। পুকুর পাড়ের কাঁচা মিঠের আম তার ডালপালা নেড়ে ফিসফিস করে বলেছিল "নিয়তি...ইন্দুবালা...নিয়তি...।"[৪]

যে পুরুষ স্ত্রীর অমতে নারীদেহ নিয়ে খেলা করে তার চরিত্র আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। আসলে মদের নেশা তার মানবিক বৃত্তির শ্রীবৃদ্ধি হতে দেয়নি। রতনলালের জুয়া আর মদের নেশা ছিল আকাশছোঁয়া। স্বামীর মাতলামি এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে, ইন্দুবালা একে একে নিজের গয়না বিক্রি করে সংসার চালাতে গিয়ে নিজেকে অলংকারহীন করে ফেলেছিল। কিন্তু এমন জীবন ইন্দুবালা কোনোদিন চায়নি। আসলে নিয়তি তার সঙ্গে বাল্যকাল থেকেই প্রতারণা করে গেছে। আর তাই তো দেখি, ইন্দুবালার বাল্যকালও খুব কষ্টের। পড়াশোনার ইচ্ছে থাকলেও মায়ের অমতের জন্য হাইস্কুলের গণ্ডি টপকাতে পারেনি ইন্দুবালা। মেয়েকে সুযোগ্য পাত্রের হাতে তুলে না দেওয়া পর্যন্ত মা পালন করেন ব্রত আর বাবা মরিয়া হয়ে চিঠি লিখেন কলকাতায়,

> "ইন্দুবালা কলেজ যেতে চেয়েছিলেন। পড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু কোথা থেকে যে কী হলো! মনিরুলের সজল কালো চোখ দুটো বাঁধা থাকলো তাঁর অন্তরে। নক্সী কাঁথার মাঠের সাজুর মতো তাকে সব স্মৃতি উপড়ে নিয়ে চলে আসতে হলো এপারে। রূপাই থেকে গেল অনেক দিনের পুরোনো অতীত হয়ে।"[৫]

আমাদের সমাজে মানবিক সম্পর্কের চেয়ে ধর্মই বড়। ধর্মের বন্ধনে আমরা এমনভাবে বাঁধা পড়ে আছি যে, মানবিক সম্পর্কগুলোকে অত গুরুত্ব দিতে রাজি নয়। আর তাইতো দেখি ভিন্ন ধর্মের মনিরুলের সঙ্গে ইন্দুবালার ভালোবাসার সম্পর্কও কোনো পরিণতি পায় না। ধর্মের কাছে মাথানত করে মানবিক সম্পর্ক,

> "এক মুসলমান ছেলের সাথে এক হিন্দু মেয়ের বিয়ে? এই গ্রামের কেউ হতে দেবে না। কোনোদিন না। ঠিক সেই সময়ে ঝোপ থেকে বুড়ো তক্ষকটা যেন বলে উঠছিল ঠিক ঠিক। এই নিস্তব্ধ রাত্রে পুকুরে জলের মধ্যে ঢেউ তুলে সেই কবে রিয়াজকে ভালোবাসতে গিয়ে মরে যাওয়া স্বর্ণলতা ভেসে উঠে বলেছিল "সাবধান ইন্দু...সাবধান...ওরা তোকে বাঁচতে দেবে না...।"[৬]

নিজের মনের রাগ-দুঃখ-অভিমান নিজের কাছেই রেখে দিয়ে ইন্দুবালা মল্লিক বাড়ির বউ হয়ে কলকাতায় চলে আসে। সেখানেও সে বড় একা। তাই কান্না পেলে সে মুখে রুমাল গুঁজে কান্না করেন। আর শাশুড়ি জল ভরা মেঘের দিকে তাকিয়ে ইন্দুবালার সংসারের মঙ্গল কামনা করেন।

মদের নেশা স্বামীর অকালে প্রাণ কেড়ে নিলে তিন সন্তান নিয়ে ইন্দুবালা বিধবা হন। স্বামীর জুয়া আর মদের নেশায় এতদিন যারা আট-কপাটি পর্যন্ত বিক্রি করার সায় দিয়েছিল আজ ইন্দুবালার বিপদের দিনে তাদের আর দেখা গেল না বড় একটা। আমরা জানি, বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র করার দাবি নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সেই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে শামিল হয়ে অসংখ্য মানুষ খান সেনাদের অমানুষিক অত্যাচারের শিকার হয়। হাজার মায়ের কোল খালি হয়; ধর্ষিত হতে হয় অগুনতি নারীকে। আর সেই মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ দিতে হয়েছিল আমাদের ইন্দুবালার পরিবারের আত্মীয়-স্বজনকেও। একদিকে স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য আন্দোলনরত নিজ-পরিবার, আত্মীয়-স্বজনদের পাকিস্তানি খান সেনাদের হাতে মৃত্যুর ঘটনা অন্যদিকে স্বামী-শাশুড়িহীন সংসারে ইন্দুবালা বড় একা হয়ে পড়ে। কিন্তু এহেন পরিস্থিতিতে ইন্দুবালা কাঁদেননি। আসলে কাঁদার মতো সময় ছিল তার, কিন্তু পরিস্থিতি ছিল না। স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা যেদিন উড়ল সে দেশের মাটিতে, সেদিন এদেশের মাটিতে ইন্দুবালা ছেনু মিত্তির লেনের নীচের ঘরে উনুন ধরালেন। শুরু হল জীবনযুদ্ধের নতুন অধ্যায়। একদিকে পাওনাদারের দল অন্যদিকে ছেলে-মেয়েদের পেটের খিদের জ্বালা-এই উভয়মুখী সংকটে ইন্দুবালা যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় তখন ইন্দুবালার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন মাছ বিক্রেতা লছমী। তারই অনুপ্রেরণায় শুরু হল ইন্দুবালার ভাতের হোটেল,

> "লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে এক আনাও নেই যা দিয়ে তিনি তাঁর দোরে আসা লছমীকে মুড়ি কিনে খাওয়াতে পারেন। সাত-পাঁচ না ভেবে একটু কুণ্ঠা নিয়েই ইন্দুবালা লছমীর দেওয়া টাকাটা আঁচলে বাঁধলেন। উনুনে চাপালেন এক হাঁড়ি জল। ছোটো মেয়েকে দোতলার ঘরে ঘুম পাড়িয়ে এসে বড় ছেলে প্রদীপকে পাঠালেন সামনের মুদিখানার দোকানে। খিড়কির দরজা খুলে নিজে বাড়ির পেছনের বাগান থেকে নিয়ে এলেন সবে কচি পাতা আসা কুমড়ো শাক। গাছের পাকা লঙ্কা। শাশুড়ির

> আমলের পুরোনো ভারী শিলটা পাতলেন অনেক দিন পরে।...কয়লার আঁচে টগবগ আওয়াজে ফুটতে থাকলো কচি শাকগুলো। তার নরম পাতাগুলো।"[৭]

এই মহিলা যা-ই রান্না করে তা-ই যেন মুখে লেগে থাকে সারা জীবনের মতো। এভাবেই ইন্দুবালার হাতের সুস্বাদু রান্না খাওয়ার লোভে বাজারের সবাই এসে হাজির হয় তার নীচের ঘরে। এভাবেই আস্তে আস্তে নীচের ঘর হয়ে উঠল ইন্দুবালা ভাতের হোটেল। একটা শহরে তিন ছেলেমেয়ে আর পুরোনো বাড়িতে নিজের শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ইন্দুবালা সমস্ত শোককে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখে শুরু করে জীবনের একান্ত নিজস্ব লড়াই। আসলে কল্লোল লাহিড়ী বিশ্বাস করতেন যে,

> "ঈশ্বর, নারীকে যেমন শারীরিক শক্তিতে কিছু ঘাটতি, তেমন এক অপার সুধা, মূর্ছনা, মর্মবাণী, অফুরন্ত লোব্ররেণু, অধরা মাধুরী, আকুল পরান, আপ্লুত লাবণ্য দিয়েছেন। ...ঈশ্বর ইচ্ছে করে নারীর ছলায়, কলায়, মোহজাল, রং, রোশনাইয়ে এমন একটা প্রতিরোধ, যে মানুষ, ছিঁড়ে ঢুকতে পারে না। যাঁরা পারেন, তাঁরাই, ভুবনজয়ী। শুধু নারীকে মুঠো করতে পারলেই ভুবন নয়। নারীকে বুঝতে পারলেই, অমৃত। যাঁরা, যেসব মহাপুরুষ, দার্শনিক বলেছিলেন, নারী নরকের দ্বার, তাঁরা অসুস্থ।"[৮]

আর তাই তো আমরা দেখি যে, এই লড়াইয়ে তিনি মাঝপথে হাল ছেড়ে দেননি। তিন ছেলেমেয়েকে তিনি আগলে রেখেছিলেন কঠিন কঠোর শাসনে। কারণ তিনি জানতেন এই মল্লিক বাড়ির হাওয়া খারাপ। ছেলেমেয়েদের বিপথে যেতে বেশি সময় লাগবে না।

তাই তিনি তাদের নিজের বাড়িতেই পড়াশোনার ব্যবস্থা করেছেন। একটু বড়ো হলে তাদের স্কুলে ভর্তি করেছেন। কিন্তু তিনি নিজের সব হারানোর শোক কখনও তাদের কাছে প্রকাশ করেনি। আর সন্তানেরাও তাদের মাকে কোনোদিন কাঁদতে দেখেনি; দেখেছে শুধু মায়ের অমানুষিক পরিশ্রম এবং কর্তব্যপরায়ণ মাকে,

> "নিয়মিত ছেলেদের স্কুলে গিয়ে খোঁজখবর নিতেন ইন্দুবালা। ঠিক মতো পড়ছে কিনা।...স্কুলে ভর্তি করার অনেক আগেই বাড়িতে রেখেছিলেন পড়ানোর জন্য মাস্টার।"[৯]

এমনকি ছেলেমেয়েদের হাত ধরে শিখিয়েছেন হাতের কাজ-রান্নাবান্না, কাপড় কাচা, বাসন মাজা সবকিছু। জীবনের নানা চড়াই-উতরাই বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই ইন্দুবালাকে করে দিয়েছিল ক্ষতবিক্ষত। তাই তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তার সন্তানের ওপর এ বাড়ির পূর্বপুরুষের ছায়া কোনোদিন পড়তে দেবেন না। আর করেও দেখিয়েছেন। আদর-আহ্লাদে ছেলেমেয়েদের বড় করেননি ঠিকই কিন্তু তাদের প্রতি ভালোবাসা যে ছিল না এমনটা নয়,

> "ইন্দুবালার ভালোবাসা সেই ছোট্ট থেকে ছেলে মেয়েরা বুঝে গিয়েছিল অন্যরকম ভাবে। তাদের জন্য বড় বড় বয়ামে, কাচের শিশিতে, অ্যালুমিনিয়ামের কৌটোয় ইন্দুবালা যত্ন করে কত কিছু যে খাবার করে রাখতেন। কোনটাতে নাড়ু, কোনটাতে মুড়ির মোয়া, চিড়ে ভাজা, কুচো নিমকি, গজা। আরও কত কী যে!"[১০]

ইন্দুবালা জানতেন একটাকে দাঁড় করাতে পারলে বাকিগুলো দাঁড়িয়ে যাবে সহজেই। আর হয়েছেও তাই।

ইন্দুবালার প্রত্যেক ছেলেমেয়ে আজ সেটেলমেন্ট। অন্যদিকে তিনিও শত বিপদকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিজ-কর্মজগতে আপন প্রতিভায় সমুজ্জ্বল। কালেক্টার অফিসের কেরানিকুল থেকে শুরু করে মেসবাড়ির ছেলেমেয়ে পর্যন্ত ইন্দুবালার হাতের সুস্বাদু রান্না খাওয়ার জন্য পাগল,

> "যত খাটছিলেন ইন্দুবালা হোটেলকে নিয়ে, তত তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ছিল দিকে দিকে। এবেলার রান্না কোনদিন ওবেলা কাউকে খাওয়াননি তিনি। কোনো খাবার নষ্ট হতে দেননি কোনোদিন। বেঁচে যাওয়া খাবার কোথায় কোথায় যাবে তারও একটা নির্দিষ্ট ঠিকানা তৈরী করে ফেলেছিলেন। সেইসব মানুষগুলো আজও অনেক আশা নিয়ে বসে থাকে।"[১১]

আর ইন্দুবালাও ঠাকুরের আপ্ত বাক্য যা সারাজীবন মেনে চলেছেন, 'জীবে প্রেম'। হোটেল যবে থেকে শুরু হয়েছিল সেদিন থেকেই তিনি মানবসেবায় রত। প্রতিদিন প্রায় তিনশোজনের রান্না তিনি ধনঞ্জয়কে সঙ্গে নিয়ে একা হাতে করে গেছেন।

আমরা জানি, জল-স্থল অনুযায়ী মাছের-সবজির স্বাদ আলাদা হয়। মশলার পরিমাণের তারতম্য ঘটে। আর ইন্দুবালা সেটা জানতেন আরও ভালো করে। কেননা নারায়ণ সেবায় তিনি কোনো ত্রুটি রাখতে রাজি নন। নারায়ণ দু-মুঠো খেয়ে খুশি তো তিনিও খুশি,

> "কোথাকার কোন মাছ। কোন পুকুর, দিঘি, বিল সব ইন্দুবালার জানা চাই। না হলে রাঁধবেন কী করে? জল অনুযায়ী মাছের স্বাদ আলাদা হয় সবাই জানে সেটা। কিন্তু রান্না, সেটাও তো আলাদা হয়! শুধু কি তাই? কোথাকার বেগুন। কোথাকার লঙ্কা? কোথাকার ঢেঁড়শ জানা না থাকলে তাঁর রান্নায় মন বসে না। কুটনো কুটতে বসলে কড়াইতে ফোড়ন দিয়ে সেই ক্ষেতটাকেই যদি চোখের সামনে না দেখতে পান তাহলে রান্নায় মজা আসে না। স্বাদটাও।"[১২]

এভাবেই ইন্দুবালার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গিয়েছিল বাসন্তীর গলদার, রিহান্দের রুই, বেলডাঙ্গার কাঁচা লঙ্কা, মেমারির কুমড়ো ইত্যাদির সঙ্গে। এসবের জন্য ছেনু মিত্তির লেনের ইন্দুবালা ভাতের হোটেলে ভিড় কোনোদিন কমে না একবেলার জন্যও,

> "শুধু যে মানুষটি আজ উনুনের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি একজন শিল্পী। যিনি নতুন সৃষ্টির উন্মাদনায় মেতে উঠেছেন। তাঁর বুড়ো ডালপালাগুলো চারিদিক থেকে যেন শুষে নিচ্ছে তারুণ্যের আস্বাদ। যে স্বাদে রয়ে গেছে নতুন করে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা।"[১৩]

আর তাই তো সত্তর পেরিয়েও ইন্দুবালা ছেলেদের সংসারে নিজেকে থিতু করেনি। তিনি চাইলেই এই অমানুষিক পরিশ্রমের জগৎ ত্যাগ করে শেষ বয়সে ছেলেদের সংসারে সুখে দিন কাটাতে পারতেন। সন্তানরাও চেয়েছিল মা তাদের সংসারে এসে থাকুক। ইন্দুবালার বড়ো ছেলে প্রদীপ প্রথম চাকরি পেয়েই মাকে দিল্লিতে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু না। আর কোনো ছেঁদো মায়ার বন্ধনে নিজেকে বাঁধতে চাননি বলেই এই হোটেলের মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রেখে নারায়ণের সেবা করে গেছেন। হোটেল যবে থেকে শুরু হয়েছিল সেই বছর পুজো থেকে বিজয়ার মিষ্টিও তৈরি করতে শুরু করেছিলেন ইন্দুবালা। ছেলেরা এসে ব্যাগ ভর্তি করে নিয়ে যেত সেসব আর তাদের পুজো উপলক্ষ্যে নতুন জামা কেনার, ঠাকুর দেখার ভালোবাসার গল্পের ভাগ দিয়ে যেত মাকে। কিন্তু ইন্দুবালার,

> "...কিছু ভাগ করার থাকে না। তিনি শুধু অফুরন্ত বিলিয়ে চলেন তাঁর স্মৃতি রান্নার এক পদ থেকে অন্য পদে। যারা বুঝতে পারে তারা একটু বেশি আনন্দ পায়। আর যারা খাবারের সাথে মজে থাকে তারা শুধু রসনায় মজা পায়। ভেতরের মানুষটার নয়।"[১৪]

আর অধিকাংশ মানুষ বলতে গেলে একমাত্র লছমী ছাড়া আর কেউ-ই ইন্দুবালাকে বুঝতে পারেনি। আর তাইতো ইন্দুবালার হাতের তৈরি কুমড়ো ফুলের বড়া, বিউলির ডাল, ছ্যাঁচড়া, আম তেল, মালপোয়া, চিংড়ির হলুদ গালা ঝোল, চন্দ্রপুলি, কচু বাটার রসনাই তৃপ্ত থেকেছে অধিকাংশ মানুষ। তার মনের কেউ হদিস পায়নি; এমনকি ছেলেরাও।

সবশেষে বলা যায় যে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় আধিপত্যবাদী পুরুষ কর্তৃত্বের চোখরাঙানিকে ইন্দুবালা নিজের জীবনের সঞ্জীবনী শক্তিতে পরিণত করে নারীজীবনের ধারাকে অন্য খাতে বইয়ে দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি কখনই বিশ্বাস করতেন না যে, নারী সর্বদা পুরুষের আশ্রিত, পরাধীন। নারীর নিজস্ব কোনো প্রতিভা নেই, ঋষিত্ব নেই। তিনি বিশ্বাস করতেন অবমাননা-লাঞ্ছনা থেকে মুক্তির দায়িত্ব নারীকে নিজেই নিতে হবে। তাইতো আমরা দেখি, ইন্দুবালা সামাজিক আর মানসিক চাপকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে অর্থাৎ তিনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চাপিয়ে দেওয়া মর্যাদা না মেনে নিজের শক্তি প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর। নারীর স্বকীয়তায় বিশ্বাসী ইন্দুবালা আধুনিক নারীর মানসিক স্বাধীনতার অন্যতম নিদর্শন।

তথ্যসূত্র:

১. ভট্টাচার্য, তপোধীর। প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব। অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, ২০০৬, কলকাতা, পৃ. ১২৬।
২. লাহিড়ী, কল্লোল। ইন্দুবালা ভাতের হোটেল। সুপ্রকাশ, ২০২১, কলকাতা, পৃ. ৩৯।
৩. নাসরিন, তসলিমা। নির্বাচিত কলাম। আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৭, কলকাতা, পৃ. ১৭।
৪. লাহিড়ী, কল্লোল। ইন্দুবালা ভাতের হোটেল। সুপ্রকাশ, ২০২১, কলকাতা, পৃ. ৪২।
৫. তদেব, পৃ. ৫০।

৬. তদেব, পৃ. ১৩০।
৭. তদেব, পৃ. ৯।
৮. চক্রবর্তী, কমল। সত্য-ব্রতী। অভিযান পাবলিশার্স, ১৪২৮, কলকাতা, পৃ. ৩৮।
৯. লাহিড়ী, কল্লোল। ইন্দুবালা ভাতের হোটেল। সুপ্রকাশ, ২০২১, কলকাতা, পৃ. ১২১।
১০. তদেব, পৃ. ১২৪।
১১. তদেব, পৃ. ১৪১।
১২. তদেব, পৃ. ৯৪।
১৩. তদেব, পৃ. ৮৭।
১৪. তদেব, পৃ. ১৩৫।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. ভট্টাচার্য, তপোধীর। প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব। অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ২০০৬।
২. লাহিড়ী, কল্লোল। ইন্দুবালা ভাতের হোটেল। সুপ্রকাশ, কলকাতা, ২০২১।
৩. নাসরিন, তসলিমা। নির্বাচিত কলাম। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৭।
৪. চক্রবর্তী, কমল। সত্য-ব্রতী। অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪২৮।